



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 117 - 122

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

জ্যোতির্ময়ী দেবীর ছোটগল্পের বিষয়বিশ্ব

জীবন মহন্ত

গবেষক, বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: mohantajiban07@gmail.com



Received Date 15. 06. 2026

Selection Date 15. 07. 2026

Keyword

Feminist
Consciousness,
Marginalized
Voices, Patriarchal
Hypocrisy, Purdah
System in
Rajasthan,
Psychological
Oppression, Dowry
and Daughterhood,
Plight of Hindu
Widows, Religious
Ritualism, Refugee
Trauma, Economic
Independence.

Abstract

This paper explores the multifaceted thematic landscape of Jyotirmoyee Devi, a pioneering yet often underrepresented voice in 20th-century Bengali literature. Far from the conventional narratives of her time, her short stories delve deep into the socio-cultural realities of rural and urban Bengal, reflecting a sharp critique of patriarchal structures, caste dynamics, and institutional hypocrisy. This analytical study examines how her “thematic universe” seamlessly integrates the historical trauma of the Partition of India with the silent, everyday struggles of marginalized individuals, particularly women. By portraying female protagonists who possess quiet resilience and intellectual clarity, Jyotirmoyee Devi dismantles the idealized, submissive tropes of womanhood. Furthermore, the paper investigates her unique narrative techniques and stark realism, which challenge contemporary societal norms. Ultimately, this study highlights her distinct contribution to Bengali fiction, positioning her thematic innovations as vital precursors to modern feminist and social consciousness in Indian literature.

Discussion

বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা কথাসাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে কয়েকজন কথাসিদ্ধী প্রথাগত ধারার বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব, নিরাসক্ত এবং প্রগতিশীল একটি সাহিত্যিক জগৎ নির্মাণ করতে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪-১৯৮৮) এক চিরব্যতিক্রমী ও প্রোজ্জ্বল নাম। তাঁর সমসাময়িক কালের বহু প্রথিতযশা লেখক যখন রোমান্টিক ভাবালুতা, অলংকারিক ভাষার জটিলতা, কাল্পনিক রোমাঞ্চ কিংবা একপ্রকার আধ্যাত্মিক ভাববাদী দর্শনে আচ্ছন্ন ছিলেন, জ্যোতির্ময়ী দেবী তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বাস্তববাদী পথ অবলম্বন করেছিলেন। তিনি সমাজ-বাস্তবতা ও নারীর মনস্তত্ত্বের এমন এক নিরাসক্ত, নির্মোহ এবং তীক্ষ্ণ রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, যা আজ একবিংশ শতকে দাঁড়িয়েও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক এবং নতুন তাত্ত্বিক আলোচনার দাবি রাখে। দে'জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত চার খণ্ডের ‘জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন’-এর পাতা ওলটালে চেনা-অচেনা যে বহুমাত্রিক ও বৈচিত্র্যময় জগতের সঙ্গে আমাদের নিবিড় পরিচয় ঘটে, তা কেবল নারীর অবরুদ্ধতার করুণ আখ্যান বা কান্নার ইতিহাস মাত্র নয়— তা আসলে পিতৃতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক দ্বিচারিতা, সমাজ কাঠামোর চরম ভণ্ডামি, দেশভাগের ঐতিহাসিক ট্রাজেডি, বর্ণবাদের অন্যায় সামাজিক বিন্যাস এবং

সর্বোপরি তীব্র সংকটে পড়া মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার এক অমোঘ ও অকাট্য দলিল। তাঁর গল্পগুলি কেবল সমাজ পরিবর্তনের কোনো সম্ভাব্য রাজনৈতিক স্লেগান দেয় না, বরং সামাজিকভাবে লালিত কুসংস্কারের গভীরে লুকিয়ে থাকা ক্ষতগুলিকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারের মতো ব্যবচ্ছেদ করে দেখায়। এই কারণেই তাঁর সামগ্রিক সৃষ্টিকে কোনো সংকীর্ণ গণ্ডিতে না বেঁধে একটি সুবিশাল ‘বিষয়বিশ্ব’ হিসেবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

লেখিকার জীবন ও তাঁর সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার পটভূমি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় এবং দীর্ঘ সামাজিক অভিজ্ঞতায় পুষ্ট ছিল। তাঁর জীবনের একটা দীর্ঘ এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ কেটেছিল রাজস্থানের জয়পুরে। ফলে সেখানকার অত্যন্ত রক্ষণশীল, সামন্ততান্ত্রিক রাজপুত সমাজের অন্দরমহল, কঠোর পর্দাপ্রথা এবং সেই প্রথার অন্তরালে নারীর যে তীব্র মানসিক অবদমন চলে, তাকে তিনি অত্যন্ত কাছ থেকে দেখার এবং গভীরভাবে অনুভব করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সুদীর্ঘ রাজস্থানি জীবনের অভিজ্ঞতাই মূলত তাঁর সাহিত্যিক চেতনার প্রথম ভিত তৈরি করতে বড় ভূমিকা নিয়েছিল এবং তাঁর ছোটগল্পের বিষয়বিশ্বের এক বড় অংশ জুড়ে এই পটভূমি স্থায়ী আসন লাভ করেছে। রাজস্থানি অন্দরমহলের এই বাহ্যিক রাজকীয় আভিজাত্য এবং অভ্যন্তরীণ নির্মম অন্ধকারের বৈপরীত্যকে তিনি অত্যন্ত নিখুঁত ও প্রতীকী ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর ‘নন্দরাণীর সংসার’ গল্পে। এই গল্পে আমরা দেখতে পাই, বাইরের মার্বেল পাথরের চোখাধাঁধানো জৌলুস কীভাবে ভেতরের অন্ধকারের নিষ্ঠুরতাকে আড়াল করতে চেয়েছিল। আভিজাত্য ও সামাজিক মর্যাদার আড়ালে থাকা নারীর এই জড়বৎ, গুরুত্বহীন ও পুতুলরূপী অস্তিত্বের আসল পরিচয় দিতে গিয়ে লেখিকা রচনা-সংকলনের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করেন—

“বাহিরের মার্বেল পাথরের জৌলুস আর ভেতরের অন্তঃপুরের অন্ধকার যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, যেখানে নারী কেবলই এক অলংকার।”^১

পর্দার আড়ালের এই বন্দিত্ব কেবল শারীরিক বা বাহ্যিক চার দেওয়ালের সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা নারীর নিজস্ব দেখার চোখ, স্বাধীন চিন্তাভাবনা, নিজস্ব সম্ভা বা দেখার দৃষ্টিভঙ্গিকে মারাত্মকভাবে শৃঙ্খলিত, অবদমিত ও পঙ্গু করত। রাজস্থানি সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খলের এই চূড়ান্ত ও নির্মম রূপটি কোনো সম্ভাব্য আবেগপ্রবণতা ছাড়াই গভীর সমাজতান্ত্রিক নিরাসক্তিতে ধরা পড়েছে লেখিকার ‘পর্দানশীন’ গল্পে। এই গল্পে সামাজিক প্রথা ও প্রাচীন অনুশাসন মানুষের জীবনের চেয়ে, বিশেষ করে নারীর মানবিক অধিকারের চেয়ে অনেক বড় ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সেখানে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, বেদনাকাতর ও বাস্তবসম্মত ভাষায় বলা হয়েছে—

“পর্দার আড়ালে যে চোখ দুটো সমাজকে দেখে, তা শুধু অবদমন দেখে না, দেখে এক অলিখিত দাসত্বের দীর্ঘ ইতিহাস।”^২

জ্যোতির্ময়ী দেবী দেখিয়েছেন যে, এই পর্দা প্রথা আসলে নারীকে সমাজ ও জ্ঞানজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার একটি অত্যন্ত পরিকল্পিত পিতৃতান্ত্রিক হাতিয়ার, যা নারীর নিজস্ব বৌদ্ধিক বিকাশকে অন্ধুরেই বিনষ্ট করে দেয়। এই ব্যবস্থার ফলে অন্দরমহলের চার দেওয়ালের মধ্যে নারীদের মানসিক চেতনা কীভাবে ধীরে ধীরে অসাড় হয়ে পড়ে, তারই এক প্রামাণ্য চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর এই পর্বের গল্পগুলিতে।

রাজস্থানি সমাজের এই পর্দার অন্ধকার ও সামন্ততান্ত্রিক নির্মম শাসনকে পেছনে ফেলে লেখিকা যখন তাঁর লেখনী ও মনোযোগকে বাংলার চেনা গ্রামীণ ও মধ্যবিত্ত সমাজে স্থানান্তরিত করেন, তখন বাহ্যিক শৃঙ্খলের নাম, রূপ ও ভৌগোলিক পরিবেশ কিছুটা বদলায় সত্য, কিন্তু নারীর প্রতি সমাজের বাণিজ্যিক, বৈষম্যমূলক ও নিরেট নির্মম দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতই থেকে যায়। জ্যোতির্ময়ী দেবীর বিষয়বিশ্বের একটি বড় স্তম্ভ হলো গ্রামীণ ও আধা-শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর ব্যবচ্ছেদ। সমকালীন বিবাহ বাজারে কন্যাপক্ষের চরম অসহায়তা, যৌতুকের নির্মম দাবি এবং কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ার কারণে পিতার সামাজিক গ্লানি ও লাঞ্ছনাকে অত্যন্ত নগ্ন ও বাস্তবসম্মত ভাবে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর বিখ্যাত ‘বেটিকা বাপ’ গল্পে। সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রামীণ পিতৃতন্ত্রের এই বৈষয়িক, কুৎসিত ও বাণিজ্যিক রূপটি ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন—

“কন্যাসন্তানের জন্ম যেন এক আজীবন দণ্ড, যাহার খেসারত পিতাকে দিতে হয় সমাজের দরবারে মাথা নত করিয়া।”^৩

নারীর এই পণ্যে রূপান্তরিত হওয়ার ট্রাজেডি কেবল বাহ্যিক আর্থিক দেনা-পাওনা বা অর্থনৈতিক লেনদেনের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই ফুরিয়ে যায় না। এই সামাজিক অবমাননা ও পণ্যায়ন নারীর ভেতরের মনস্তাত্ত্বিক সত্তা, আত্মসম্মান এবং নিজের আত্মদর্শনের মনের আয়নাটাকেও ভেঙে চুরমার করে দেয়। নিজের চারপাশের এই রূপ ও আত্মমূল্যের অবক্ষয়ের চরম মানসিক দিকটির সন্ধান আমরা পাই লেখিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প ‘আয়না’-তে। এই গল্পে এক তরুণীর আত্মদর্শনের মধ্য দিয়ে সমাজের চাপিয়ে দেওয়া কৃত্রিম সৌন্দর্যের মাপকাঠি ও ভণ্ডামিকে তীব্র উপহাস করে লেখিকা দ্বিতীয় খণ্ডে দেখিয়েছেন—

“আয়নায় যে মুখ দেখা যায়, তাহা নিজের নয়, তাহা সমাজের তৈরি করা এক পুত্তলিকা মাত্র।”^৪
জ্যোতির্ময়ী দেবীর বিষয়বিশ্ব কেবল বাইরের সামাজিক অবিচারের বিবরণেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা নারীর মনস্তত্ত্বের গভীর গহীনে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। এই সামাজিক অবদমন ও বঞ্চনার সমান্তরালে মধ্যবিত্ত পরিবারের অভ্যন্তরে নারীর মানসিক জটিলতা এবং মনের গোপন কোণের না-বলা কথাগুলির এক অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর আমরা খুঁজে পাই সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ডেরই অন্য একটি সামাজিক গল্প ‘মনের অগোচরে’-তে। এখানে মানুষের অবদমিত কামনা ও সামাজিক শৃঙ্খলের মধ্যকার মনস্তাত্ত্বিক সংঘাতকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে লেখিকা লিখেছেন—

“মানুষের মনের গহীনে যে কত অন্ধকার অলিগলি থাকে, সমাজ তাহার খবর রাখে না; সে শুধু বাহিরের শাসনটুকু চেনে।”^৫

লেখিকা অত্যন্ত সুনিপুণভাবে দেখিয়েছেন যে, সমাজ যখন মানুষের বাইরের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যস্ত থাকে, তখন মানুষের অন্তর্ভাগে এক নীরব ও মারাত্মক ভাঙন চলতে থাকে। এই মানসিক ভাঙন ও একাকীত্বকে তিনি তাঁর গল্পে অত্যন্ত নিরাসক্ত ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন, যা বাংলা সাহিত্যে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের এক আদি নিদর্শন।

কন্যাপেটের অভিষেক কিংবা রূপের বাজারের এই মানসিক ও সামাজিক নির্যাতন আরও ভয়ঙ্কর ও অমানবিক রূপ ধারণ করে যখন এক নারী সমাজ নির্ধারিত ‘বিধবা’র তকমা লাভ করে। হিন্দু উচ্চবর্ণের সমাজে বিধবাদের জীবন কেমন নরকতুল্য ছিল, তা জ্যোতির্ময়ী দেবী কেবল দূর থেকে দেখেননি, বরং নিজের জীবন দিয়ে তা উপলব্ধি করেছিলেন। লেখিকা নিজে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে বিধবা হয়ে শাস্ত্রীয় অনুশাসনের চরম নির্মমতা, খাদ্যাভ্যাসের কঠোরতা এবং সামাজিক উৎসব থেকে নির্বাসনের যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন। তাই বাংলার সাধারণ সামাজিক শোষণের স্তর থেকে বৈধব্যের চরম ট্রাজেডিতে উত্তরণের এই পথটি তাঁর নিজের অত্যন্ত চেনা ও রক্তক্ষরণময় ছিল। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই তাঁর সাহিত্যিক বিষয়বিশ্বকে এক অসামান্য গভীরতা ও সত্যতা দান করেছে। তাঁর ‘অন্তঃসলিলা’ গল্পটি হিন্দু উচ্চবর্ণের বিধবার অবদমিত কামনা, সুপ্ত মানবিক বাসনা এবং সামাজিক বঞ্চনার এক অসামান্য মনস্তাত্ত্বিক আখ্যান। এই গল্পে সমাজের তীব্র রক্ষণশীলতা ও শুচিবাহিকে সরাসরি আক্রমণ করে সংকলনের তৃতীয় খণ্ডে তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন—

“জীবন্ত মানুষের চিতার ওপর যাহারা সমাজধর্মের ধ্বজা ওড়ায়, তাহারা বিধবাকে ডাইনি সাজাইতে দ্বিধা করে না।”^৬

ধর্ম ও লোকসংস্কারের নামে নারীর এই আজীবন ত্যাগের মহিমাম্বিত ভণ্ডামিকে জ্যোতির্ময়ী দেবী কখনোই মুখ বুজে মেনে নিতে পারেননি। ধর্মের এই মেকি ও পুরুষতান্ত্রিক সুবিধাবাদী রূপকে তিনি তাঁর গল্পে বারবার ব্যবচ্ছেদ করেছেন। একই সঙ্গে তীর্থের পুণ্য অর্জনের নামে বয়স্কা বা বিধবা নারীদের বাড়ি থেকে একপ্রকার বিদায় করার যে সামাজিক পলায়নবৃত্তি ও ধর্মীয় শোষণের অন্ধকার দিক ছিল, তাকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ধারালো ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন সংকলনের এই খণ্ডেরই পরবর্তী গল্প ‘তীর্থফল’-এ। সেখানে তিনি ঘরের কোণের নিত্যদিনের বাস্তব নির্যাতনকে তীর্থের চেয়ে বড় করে দেখিয়ে লিখেছেন—

“তীর্থের পুণ্যের চেয়ে ঘরের কোণের লাঞ্ছনা অনেক বেশি বাস্তব, যেখানে প্রতিদিন একটি আত্মা মরিয়া যায়।”^৭

তথাগত ধর্মের এই প্রাচীন অনুশাসন যে কতটা অমানবিক, অন্তঃসারশূন্য ও ফাঁপা, তা তৃতীয় খণ্ডের ‘বৈশাখের নিঃশব্দ মেঘ’ গল্পে এসে আরও প্রকট ও হৃদয়বিদারক হয়ে ওঠে। ধর্মের তথাকথিত কৃত্রিম পবিত্রতা ও আচার-বিচারের প্রাচীর

কীভাবে মানুষের স্বাভাবিক স্নেহ, প্রীতি, পারিবারিক বন্ধন ও ভালোবাসাকে অবশ্য ও পঙ্গু করে দেয়, তা দেখাতে গিয়ে লেখিকা অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে বলেন—

“ধর্মের যে আচার মানুষকে মানুষ হইতে দূরে সরাইয়া দেয়, তাহা ঈশ্বরের সেবা নহে, তাহা সমাজের এক কুৎসিত ব্যাধি।”^৮

এতক্ষণ ঘরের কোণের যে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক লাঞ্ছনার ইতিহাস জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর গল্পে অত্যন্ত নিপুণভাবে রচনা করছিলেন, ১৯৪৭ সালের দেশভাগ বা ভারত বিভাজনের ফলে তা এক লহমায় ঘরোয়া জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়িয়ে এক সর্বগ্রাসী জাতীয় ও সামাজিক বিপর্যয়ে রূপ নেয়। দেশভাগের এই ঐতিহাসিক ট্রাজেডি জ্যোতির্ময়ী দেবীর বিষয়বিশ্বকে এক সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা ও বিশালতা দান করে। দেশভাগের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লাঞ্ছিত, অপহৃত, নিগৃহীতা ও ধর্ষিতা নারীদের পুনর্বাসন এবং তাদের পরিবারে ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের তথাকথিত ‘পবিত্রতা’ ও ছুঁমার্গের চরম সংকীর্ণ মানসিকতাকে তিনি তীব্র চপেটাঘাত করেছেন সংকলনের চতুর্থ খণ্ডে। ‘নারীর কথা’ শীর্ষক গভীর সমাজভাবনামূলক প্রবন্ধে এবং ‘সেই ছেলেটা’ গল্পের ভাবনায় দাঙ্গার আগুনে সর্বস্ব হারানো নারীর শরীর যখন কুৎসিত রাজনীতির দাবার ঘুঁটি হয়ে ওঠে এবং সমাজ তাদের কলঙ্কিত বলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়, তখন ফোর্থ ভলিউমে এসে তাঁর কলম এক প্রতিবাদী আল্লেগরির মতো গর্জে ওঠে—

“দাঙ্গার আগুন তো এক রাতের, কিন্তু সমাজের পবিত্রতার গুঁচিবাই যে আজীবন দন্ধ করে সেইসব মেয়েদের, যাদের কোনো অপরাধ ছিল না।”^৯

দেশভাগের এই উদ্বাস্ত জীবনের চরম অনিশ্চয়তা এবং ছিন্নমূল মানুষের অস্তিত্বের সংকট কেবল দাঙ্গার সেই নির্দিষ্ট রক্তাক্ত মুহূর্তেই শেষ হয়ে যায়নি। তা ছড়িয়ে পড়েছিল দেশভাগ-পরবর্তী দীর্ঘ সময় জুড়ে, শিয়ালদহ স্টেশন কিংবা বিভিন্ন উদ্বাস্ত শিবিরের নোংরা, অস্বাস্তর ও মানবেতর গলিতে। ‘উদ্বাস্ত’ গল্পের পটভূমিতে রাজনৈতিক ট্রাজেডির সেই মানবিক বিপর্যয়, শিকড়হীনতা ও যন্ত্রণার দিকটি দেখাতে গিয়ে তিনি সংকলনের চতুর্থ খণ্ডে লিখেছেন, যেখানে মানুষের শিকড় উপড়ে ফেলার তীব্র বেদনা ব্যক্ত হয়েছে—

“দেশভাগের মানচিত্র মানুষের বুকের ওপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কাটিয়া দিয়াছে তাহার শিকড় ও আশ্রয়।”^{১০}

জ্যোতির্ময়ী দেবী এখানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন কীভাবে কাঁটাতারের রাজনীতি মানুষের হাজার বছরের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও আত্মিক সম্পর্কে এক নিমেষে ছারখার করে দিতে পারে। তাঁর গল্পে দেশভাগ কেবল কোনো ভৌগোলিক বিভাজন নয়, তা মানুষের আত্মার এক অপূরণীয় ক্ষত।

তবে জ্যোতির্ময়ী দেবীর গল্পের মূল বিষয়বিশ্ব কেবলই দুঃখ, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা আর কান্নার ইতিহাস নয়; তিনি কেবল কান্নার আখ্যান লিখেই নিজের সাহিত্যিক দায়িত্ব শেষ করেননি। এই সমস্ত সামাজিক লাঞ্ছনা ও ট্রাজেডির অন্ধকার গলি পেরিয়ে তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্ররা শেষ পর্যন্ত এক আত্মসচেতন, স্বাবলম্বী, প্রতিবাদী ও প্রতিরোধী সত্তায় রূপান্তরিত হয়। দেশভাগ, দাঙ্গা এবং বৈধব্যের আগুনে পুড়ে খাঁটি সোনা হওয়া এই নারীরা আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দয়ার পাত্রী বা করুণা ভিক্ষা করে বেঁচে থাকতে চায় না। যার চূড়ান্ত স্বাক্ষর ও প্রগতিশীল জয়গান মেলে তাঁর ‘অনন্যা’ গল্পে। এখানে তিনি এক সম্পূর্ণ আধুনিক, স্বাবলম্বী, অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন ও স্বাধীনচেতা নতুন নারীর রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, যে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সমাজের সমস্ত কুসংস্কার, ঝকুটি ও রক্তচক্ষুকে অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারে। নারীর এই নতুন আত্মপরিচয় ও নারীসত্তার জয়গান গেয়ে চতুর্থ খণ্ডের শেষভাগে লেখিকা অত্যন্ত প্রত্যয় ও সাহসের সঙ্গে লিখেছেন—

“নারীর আসল শক্তি তাহার সহনশীলতায় নয়, তাহার আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার অদম্য সাহসের মধ্যে নিহিত।”^{১১}

জ্যোতির্ময়ী দেবীর গল্পে এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী না হলে নারীর প্রকৃত মুক্তি এবং সামাজিক সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা কখনোই সম্ভব নয়। তাঁর সৃষ্ট নারীরা তাই নীরব সহনশীলতার প্রতীক নয়, বরং তারা জ্ঞান ও চেতনার আলোয় দীপ্ত এক নতুন যুগের অগ্রদূত।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর বিষয়বিশ্ব যেমন বৈচিত্র্যময়, তাঁর আখ্যানশৈলী ও বর্ণনাত্মক টেকনিকও তেমনই অনন্য। তিনি তাঁর গল্পে কোনো জটিল আলংকারিক ভাষা বা কৃত্রিম নাট্যমুহূর্ত তৈরি করার চেষ্টা করেননি। তাঁর ভাষা ছিল অত্যন্ত সহজ, সরল, স্বাভাবিক এবং নির্মমভাবে বাস্তবসম্মত। তিনি সমাজকে যেভাবে দেখেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই কোনো রঙ না চড়িয়ে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এই নিরাসক্ত বাস্তবতাবাদ তাঁর গল্পগুলিকে এক অসাধারণ বিশ্বাসযোগ্যতা দান করে। তিনি গল্পের চরিত্রগুলির ভেতরের দ্বন্দ্ব ও সামাজিক ভণ্ডামিকে তুলে ধরার জন্য অনেক সময় সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ বা আইরনি ব্যবহার করেছেন, যা পাঠকদের গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করে। তাঁর এই আধুনিক আখ্যানশৈলী সমকালীন বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নজিরবিহীন ছিল।

পরিশেষে বলা যায়, জ্যোতির্ময়ী দেবীর ছোটগল্পের বিষয়বিশ্ব এক বিশাল, গভীর, সুদূরপ্রসারী ও বহুমাত্রিক ক্যানভাসে বিন্যস্ত। রাজস্থানের পর্দার অন্তরাল ও সামন্ততান্ত্রিক অন্দরমহল থেকে শুরু করে দেশভাগের রক্তক্ষরণ, গ্রামীণ সমাজের জাতিভেদ, কুৎসিত যৌতুক প্রথা ও লিঙ্গবৈষম্য থেকে শুরু করে আধুনিক যুগে নারীর আত্মজাগরণ— সবকিছুই তাঁর লেখনীতে এক অনন্য সমাজতাত্ত্বিক দলিল হয়ে উঠেছে। এক গল্প থেকে অন্য গল্পে, এক পটভূমি থেকে অন্য পটভূমিতে যাওয়ার এই যে দীর্ঘ যাত্রাপথ, তা আসলে নারীর চিরন্তন অবদমন থেকে চূড়ান্ত মুক্তিরই এক ধারাবাহিক ইতিহাস। বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি কোনো সস্তা জনপ্রিয়তার স্রোতে গা ভাসাননি, বরং নিরাসক্ত বাস্তবতাবোধ, প্রগতিশীল সমাজচেতনা ও তীক্ষ্ণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের এক স্বতন্ত্র ‘বিষয়বিশ্ব’ ও ধারা নির্মাণ করেছেন। বিশ শতকের প্রথমার্ধে দাঁড়িয়ে তিনি যে প্রগতিশীল ও নারীবাদী চেতনার বীজ বুনেছিলেন, তা আজ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও সমান প্রাসঙ্গিক, আধুনিক এবং গভীর প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যয়নের দাবি রাখে। তিনি বাংলা সাহিত্যের এমন এক আলোকবর্তিকা, যা যুগের সীমানা ছাড়িয়ে চিরকাল সমাজকে সত্যের পথ দেখাবে।

Reference:

১. দেবী, জ্যোতির্ময়ী; *নন্দরাণীর সংসার, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন (প্রথম খণ্ড)*; সম্পাদক: সুবীর রায়চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৫
২. দেবী, জ্যোতির্ময়ী; *পর্দানশীন, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন (প্রথম খণ্ড)*, সম্পাদক: সুবীর রায়চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৮
৩. দেবী, জ্যোতির্ময়ী; *বেটিকা বাপ, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন (দ্বিতীয় খণ্ড)*, সম্পাদক: সুবীর রায়চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১২
৪. দেবী, জ্যোতির্ময়ী; *আয়না, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন (দ্বিতীয় খণ্ড)*, সম্পাদক: সুবীর রায়চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩৪
৫. দেবী, জ্যোতির্ময়ী; *মনের অগোচরে, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন (দ্বিতীয় খণ্ড)*, সম্পাদক: সুবীর রায়চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫
৬. দেবী, জ্যোতির্ময়ী; *অন্তঃসলিলা, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন (তৃতীয় খণ্ড)*, সম্পাদক: সুবীর রায়চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৮
৭. দেবী, জ্যোতির্ময়ী; *তীর্থফল, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন (তৃতীয় খণ্ড)*, সম্পাদক: সুবীর রায়চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৩
৮. দেবী, জ্যোতির্ময়ী; *বৈশাখের নিঃশব্দ মেঘ, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন (তৃতীয় খণ্ড)*, সম্পাদক: সুবীর রায়চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৮
৯. দেবী, জ্যোতির্ময়ী; *নারীর কথা, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন (চতুর্থ খণ্ড)*, সম্পাদক: সুবীর রায়চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩২

১০. দেবী, জ্যোতির্ময়ী; উদ্বাস্তু, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন (চতুর্থ খণ্ড), সম্পাদক: সুবীর রায়চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩৩

১১. দেবী, জ্যোতির্ময়ী; অনন্যা, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন (চতুর্থ খণ্ড), সম্পাদক: সুবীর রায়চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৯৭